দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 DEC 1995
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

কলেজিয়েট স্কুল সদরঘাট–৪

পিঁপড়ের সফর বইটির কথা বলছিলাম না আমার আগের লেখায়। আসলে সব মানুষের জীবনেই এমন কিছু স্মৃতি থাকে বাল্যকালের যাকে সে ভুলতে পারে না—কৈশোরকালে পড়া কিছু কিছু বই-এর স্মৃতি তার অন্যতম। পিঁপড়ের সফর আর তোষল সর্দারের কথা আমি তো জীবনে ভুলতে পারবো না। নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান আর খগেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা এই বই দু'টি এখনো আমার কাছে অম্লান মনে হয় ছোটদের জন্য লেখা সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইগুলোর মধ্যে এ বই দু'টির নাম উচ্চারিত হওয়া উচিৎ। জানি হয়তো অনেকেই এর সঙ্গে একমত হবেন না এবং একমত না হওয়াটাই হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু তখন আমরা একমত হয়েছিলাম। এ দুটি বই ছিলো আমাদের সবচেয়ে প্রিয় এবং দুনিয়ার সেরা বই। আমি সুবিমল অরুন ননী, জয়কৃষ্ণ, ইরাদাল, নাসিরুল্লাহ রহমান আমরা সবাই। আমরা সবাই মিলে পয়সা জড়ো করে বই দুটি কিনেছিলাম। এর মধ্যে ইরাদাল আর নাসিরুল্লাহর বই পড়ার তেমন অভ্যেস ছিলো না, শুধু পয়সা ওরা দিয়েছিলো। এখনো স্পষ্ট মনে আছে পিঁপড়ের সফর বইটির আকার ছিলো বড়—মনে হয় ডাবল ক্রাউন সাইজের বই ছিলো—সাবাই বই ঘাঁটা ছিলো আম রক্তের কালিতে। তেতরে বেশ কিছু ছবিও ছিলো। সেই সব ছবির শিল্পী ছিলেন কে আজ আর মনে নেই। কে জানতো একদিন বহু বছর পরে সেই বই-এর লেখকের সঙ্গে আমার সামনাসামনি দেখা হবে। তোষল সর্দার বইটির আকার অন্যান্য সাধারণ বই-এর মতোই ছিলো। বাঁধাই করা সাধারণ মলাট—কিন্তু অসাধারণ সব ছবি তেতরে। ফনীভূষণ গুপ্তের আঁকা। কতগুলো ছবির কথা এখনো আমার বেশ মনে আছে— শালুক ডাঙার পথে, হাটে, যাত্রা, পদ্মদিদির খড়ন বাড়ী ইত্যাদি। পুকুর ঘাটে পদ্মদিদির সেই ঘোমটা দেয়া মুখখানি এখনো এতো স্পষ্ট এতো মধুর যে এখনো ভাবতে ভালো লাগে। পড়ে শুনেছি এই বই-এর লেখক খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় নাকি ব্যক্তিগত জীবনে জমিদার ছিলেন। তাকে অবশ্য কখনোই দেখিনি। বহু বছর পর তোষল সর্দার বইটির একটি আধুনিক সংস্করণ আমি দেখেছিলাম। রঙচঙ এবং তেতরের সব ছবি অন্য এক শিল্পীর আঁকা। নতুন বইটি আমি হাতে নিতে পারিনি। মনে হয়েছিলো আমার সকল ভালো লাগাকে কে যেন সজোরে করে দিল এক মুহূর্তে। পদ্মদিদির ছবি কোথায় এ বইতে? সে বই আমি পড়িনি।

মাঝ খানে একবার শুনেছিলাম সত্যজিৎ রায় তোষল সর্দার বইটি নিয়ে একটি ছবি বানাচ্ছেন। শুনে মনটা খুশীতে ভরে উঠেছিলো। পথের পাঁচালী নিয়ে যিনি অসাধারণ ছবি নির্মাণ করেছেন তিনি নিশ্চয়ই পারবেন তোষল সর্দার নিয়ে ভালো ছবি নির্মাণ করতে। শুধু ভেবেছিলাম পদ্মদিদির ভূমিকায় সত্যজিৎ কাকে নেবেন— কে হবেন সেই পদ্মদিদি ফনীভূষণের আঁকা যার চেহারা এখনো আমার মনে অবিস্মরণ হয়ে আছে চিরকালের জন্যে। কিন্তু হায় শেষ পর্যন্ত সত্যজিৎতের সে ছবি হয়নি। আফসোস হয় কেন সত্যজিৎ এ ছবি না করেই মরে গেলেন। আমাদের দেশেতো ননি ভালো ছবি করার প্রতিবছর সরকারী অনুদান দেয়া হয়। সরকারকে বলে দিন না কিছু অনুদান কোনো ভালো চিত্র পরিচালককে—তোষল সর্দার কিংবা পিঁপড়ের সফর নিয়ে একটি ভালো ছবি বানাবার জন্যে।

কিন্তু ছবি বানাবার আবেদন এখন থাক। ফিরে আসি আমার কলেজিয়েট স্কুলে, সদরঘাটে। আমার সব বন্ধুদের কথায় আমার সব শিক্ষকদের কাহিনীতে।

হ্যাঁ আমি যে আমার সব বন্ধুদের কথা এখন করতে পারছি না। একটু আগে যে বদলাম সবার কথা তার মধ্যে কই বিজনের নাম তো বলিনি—বিজনও তো ছিলো আমাদের দলে। বিজন ছিলো ক্লাস ফাইতে কিংবা সিক্সে আমাদের ক্লাস মনিটর। শ্যামা রঞ্জের বিজন ছিলো বড় সরল ভালো ছেলে। নাসিরুল্লাহ ছিলো কলতাবাজারের আর ইরাদাল ছিলো সুজাপুর লোয়ার পুলের। সুবিমলদের বাসা ছিলো শঙ্খবাজারে। ওর বাবা ছিলেন উকিল আর বোন গায়ত্রী বসু ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ঢাকার ইডেন কলেজ থেকে ফার্স্ট হয়েছিলো—সে কথাতো আগেই বলেছি। জয়কৃষ্ণের পুরো নাম ছিলো জয়কৃষ্ণ সুর—সে ছিলো শাখারী বাজারের। অসম্ভব ফর্সা রঙ ছিলো জয়কৃষ্ণের আর ওর চেয়ে বেশী ফর্সা ছিলেন ওর মা। একদিন ওদের বাসায় গিয়ে ওর মাকে দেখে আমিতো হতভম্ব—এতো শাদা ফর্সা মানুষ হয়। পরে দেখেছিলাম শাখারী বাজারের প্রায় সব মানুষই অসম্ভব ফর্সা। রহমান ছিলো দক্ষিণ মৈশুডির যেখানে থাকতাম আমিও। অরুণ চন্দ্র বনাক ছিলো নবাবপুরের। অঙ্কে ভীষণ ভালো ছিলো অরুণ তবু ক্লাসে ফার্স্ট হতো সুবিমলই। হায় তুষারের কথাতো আমি ভুলেই গেছি। ভুগোলে তুষার ছিলো সবার সেরা। আর আমার যত মাতৃভাষী ছিলো বাঙ্গাল আর ইতিহাসে। ননী আমার খুব প্রিয় ছিলো—কুটবল খুব ভালো খেলতো ননী। আমিও ফুটবল খেলার পাগল ছিলাম। আমার সেই সময়কার আরো কত বন্ধু ছিলো ভুলে ওদের কথা মনে করতে পারছি না কেন। এইতো নামের আর সায়েজের কথা মনে পড়েছে। ওরা দুইভাই। রোজনপুরের বিখ্যাত করিম কটেজের বাসিন্দা ছিলো ওরা। বিখ্যাত ব্যবসায়ী রওশন জামিলের ছোট ভাই দু'জন। নাসের আমার সঙ্গে পড়তো—সায়েজ আমার এক ক্লাস উপরে। গহরত জামিলের ট্রুপে পরে সায়েজও নাচতো—সম্ভবত আবু সায়েজী নামে। নাসেরের একটা ব্যাপার নিয়ে বেশ মজা হত। নাসের খুব ফিটফাট থাকতো সব সময়। বড় লোকের ছেলে কাজেই কাপড় জামাও ছিলো সুন্দর সুন্দর। নাসের পকেটে দু'টো রুমাল রাখতো—একটা মুখ মোছার জন্যে অন্যটা জুতা মোছার জন্যে। গোলমাল হয়ে যেতো যখন নাসের জুতা মোছার রুমাল দিয়ে তুলে করে মুখ মুছে ফেলতো। সায়েজ ওয়াপদার অফিসার ছিলো অনেছি এখন। মার্কিন মুল্লুক প্রবাসী আর নাসের ব্যবসা করছে—থাকে ধানমন্ডি নিজের বাড়িতে। তবে বহদিন কোনো দেখা সাক্ষাৎ নেই। সম্ভবত ক্লাস ফাইতে নতুন একজন এলো আমাদের ক্লাসে—ছোটখাট ফর্সা চেহারা। বেশ ভালো ছাত্র আবার গানও গাইতে পারতো। মনজুর মোরশেদ। মনজুর মোরশেদ পরে সিএসপি হয়েছিলো—বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতও ছিলো বিলিপিনে। আমাদের বিশ্বখ্যাত দাবা খেলোয়াড় নিয়াজ মোর্শেদের বাবা। বাকি সব কথাতো সবারই জানা। আশীর দশকে কবি ইমরান নূরের সৌজন্যে একবার দেখা হয়েছিলো মনজুর মোরশেদের সঙ্গে। সোনাদগাঁও হোটেলে— বাহিল

40

কলেজিয়েট স্কুলের সেই সময়কার শিক্ষকমণ্ডলীর কথা ওই স্কুলের ছাত্ররা কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। তারা তো কেউ চাকরী করতেন না—শিক্ষকতাকে তারা তো একটি ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। আমরা ভয় করতাম শিক্ষকদের সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা করতাম সম্মান করতাম আর ভালোবাসতাম—

ফজল শাহাবুদ্দীনের কলাম

ডে জাতীয় কোনো একটি পার্টিতে। মনজুর মোরশেদকে দেখে আমি শুধলাম ইমরান নূরকে—এই যে বসে আছে ওই টেবিলে মনজুর মোরশেদ না—আপনাদের সিএসপি?

ইমরান নূর বললেন, ঠিকই চিনেছেন।

বললাম, ও আমার স্কুলের বন্ধু।

ইমরান নূর বললেন, চলুন আলাপ করিয়ে দেই নতুন করে।

এবং আলাপ করিয়ে দিলেনও।

আমি নিজেও উৎসাহী হয়ে ওকে কলেজিয়েট স্কুলের কথা বললাম। অতি উৎসাহী হয়ে স্কুলের সুবাদে ওকে তুমিও বলে ফেললাম। কিন্তু মনজুর মোরশেদ জবাব দিলো আপনি করে। কলেজিয়েট স্কুলের প্রসঙ্গটিকেও মোটেই পাত্তা দিলো না। বুঝলাম, সে কলেজিয়েট স্কুলের দেবেলে নেয়ে কথা বলতে চায় না। সত্যিইতো। যতো ছাত্রই কলেজিয়েট স্কুলের দেবেলে নেয়ে কথা বলতে চায় না। সত্যিইতো। যতো ছাত্রই কলেজিয়েট স্কুল থেকে পড়ে এসেছে তার মধ্যে কজন হতে পেরেছে সিএসপি। মানুষের বয়েস বেড়ে গেলে সমাজের নানা স্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে বুঝি এমনিই হয়। সবাই কি হয়? জানি না।

আগেই বললাম না, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রায় যাতায়াতি আমাদের স্কুলটা ভেঙ্গে গেলো। আমার বেশীর ভাগ বন্ধুরাই ঢাকা ছেড়ে চলে গেলো। সুবিমল বিজন ননী এমনকি নবাবপুরের অরুণ বনাক কিংবা শাখারী পট্টির জয়কৃষ্ণ সুর ওর ভাই অতুল কৃষ্ণ সুর কেউ থাকলো না ঢাকায়। আজ ওরা কে কোথায় আছে কে জানে। সবাই বেঁচে আছে কিনা তাইবা কে জানে। স্কুলের পুরনো বাড়ি থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেয়া হল, বন্ধুরা সব হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেলো। কেমন যেন সব ছাড়া ছাড়া। আমাদের টীচাররাও বেশীরভাগ চলে গেলেন ভারতে।

কলেজিয়েট স্কুলের সেই সময়কার শিক্ষকমণ্ডলীর কথা ওই স্কুলের ছাত্ররা কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। কেমন করে ভুলবে। তারা তো কেউ চাকরী করতেন না—শিক্ষকতাকে তারা তো একটি ব্রত হিসেবে নিয়েছিলেন। আমরা ভীষণ ভয় করতাম আমাদের শিক্ষকদের এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা করতাম সম্মান করতাম আর ভালোবাসতাম। আসলে তখন ভালোবাসার প্রসঙ্গটি বেশ প্রবল ছিলো আমাদের মধ্যে। আমরা স্কুলকে ভালোবাসতাম, বন্ধুদের ভালোবাসতাম, আমাদের সেই পুরনো ঢাকা শহরটাকে ভালোবাসতাম এবং সর্বোপরি আমাদের পড়াশোনাকেও ভালোবাসতাম। আর আমাদের মধ্যে এই ভালোবাসাকে তো ভরে দিয়েছিলেন আমাদের শিক্ষকরাই।

কেমন করে আমরা ভুলবো তাঁদের?

কিন্তু ভুলে কি যাইনি? আমার সব শিক্ষকদের কথা কি আমার এখনও মনে আছে?

সবার নাম কি উচ্চারণ করতে পারবো এখন?

আমি যখন নারিন্দার মেথর খানা স্কুল থেকে এসে ভর্তি হয়েছিলাম কলেজিয়েট স্কুলে তখন ক্লাস ফোরে আমাদের ক্লাস টীচার ছিলেন যদু বাবু। আমাকে প্রথম দিন স্কুলে নিয়ে গিয়েছিলেন হারুন মামা। আমার হারুন মামার আসল নাম মোহম্মদ আতীকুল্লাহ। হারুন মামা তখন সবেমাত্র কলেজিয়েট স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়েছেন। বোর্ডে নবম স্থান নিয়ে। আসলে হারুন মামারই বোর্ডে ফার্স্ট হওয়ার কথা—কেননা ক্লাসে তিনিই ফার্স্ট হতেন। কলেজিয়েট স্কুলের তখন এটাই প্রায় নিয়ম ছিলো। কিন্তু ক্লাসের সেকেন্ড বয় এনায়েত করিম হয়ে গেলো বোর্ডে ফার্স্ট আর হারুন মামা হলেন নাইনথ। এনায়েত করিম পরে পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। বাংলাদেশের ফরেন সেক্রেটারী ছিলেন। বেশ কয় বসেই মারা গেছেন তিনি। পরীক্ষায় ব্যর্থতার এ দুঃখ মামাকে জ্বালিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু মামার দুঃখের কথা থাক আমার ভর্তির দিনে ফিরে আসি।

ভর্তির দিনে আমাকে একা একটি বেঞ্চিতে বসতে দেয়া হল। মামা বললেন, এখানে বসে থাক্ চুপ করে। অফুনি তোর পরীক্ষা নিবে।

পরীক্ষা? বুকটা কেমন ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। এতো বড় স্কুল। এতো বিশাল দালান। এতো-বড় বড় ক্লাস রুম। চারদিক এতো খোলামেলা। এখানে ওখানে মাঠ বড় বড় গাছ বাগান। প্রথম একটা বাতাস কেবলই ঘুরছে সারা স্কুলটাকে ঘিরে ঘাবড়ে যাবারই কথা। লেগেও।

হারুন মামা হেসে বললেন, ঘাবড়াবার কিছু নাই। ওই যে যদু বাবু আসছেন। যা যা জিজ্ঞেস করবেন ঠিক ঠিক উত্তর দিবি।

যদু বাবু আসছেন। বিষম বিস্ফারিত নেত্রে প্রত্যক্ষ করলাম যদু বাবুকে। লম্বা, ফর্সা সুন্দর চেহারা মাথায়-অল্প টাকের চিহ্ন, হাসি হাসি মুখ। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা। আজও আমার মনে আছে—স্পষ্ট নয় তবু মনে আছে। ক্লাসে ঢোকার আগে মামার পকেট কী যেন আলিপ করলেন। তারপর সরাসরি এসেন আমারি সামনে। নাম জিজ্ঞেস করলেন, হাসলেন, তারপর বললেন—কী, ক্লাস পছন্দ তো?

আমি ঘাড় কাত করে জবাব দিয়েছিলাম।

আমার কিন্তু কোনো পরীক্ষা দেননি যদু বাবু সেদিন। শুধু একটা কবিতা আবৃত্তি করতে বললেন। আগেই মুখস্ত করে এসেছিলাম। কাজেই কোনো অসুবিধে হল না। গরগর করে আবৃত্তি করে ফেললাম।

শুনে যদু বাবু বলেছিলেন বা বেশতো। ব্যাস স্লামার ভর্তি পরীক্ষা শেষ। যদু বাবু বললেন তার ক্লাসে আমাকে নেবেন। সুতরাং সাঙ্গ হল ভর্তিলীলা। আর আজকাল? কী এক ভয়ঙ্কর কোচিং-এর যুগে এসে উপস্থিত হয়েছি আমরা।

যদু বাবু ছিলেন আমাদের ক্লাস টীচার বাংলা পড়াতেন। সত্যেন দত্তের সেই কবিতাটা কী সুন্দর করে পড়াতেন তিনি যার মধ্যে আছে বাংলাদেশের কথা—কোথায় ফলে সোনার ফসল সোনার কমল ফোটেরে সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরি বাংলারে। এখন স্বপ্নের মতো মনে হয় সেইসব দিন, সেইসব ক্লাস। পিতার মতো, বন্ধুর মতো ছিলেন শিক্ষকরা সব। সুরেশ বাবু আর শচীন বাবু পড়াতেন ইংরেজী। ঘটক স্যার পড়াতেন বাংলা যাদবদা চরিপদ স্যারও তাই। সুকুমার বাবু পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন—ক্লাস নাইন-টেন-এ বাংলা পড়িয়েছেন আমাদের। ড্রিল টীচার ছিলেন কামিনী বাবু। আমিন স্যারের কাছে শুকনো থাকতো একটা শক্ত বেত—কচিৎ কদাচিত হীরাগাল মার্কা ছাত্রদের হাতের তালুতে মারতেন বেত। চান্দু বাবু নাকি ক্রিকেট খেলতেন খুব ভালো। একবার তার ওভার বাউন্ডারি কল দিয়ে নাকি গীর্জার ঘড়ির কাঁচ ভেঙে দিয়েছিলো। হাকিম স্যার শাহাবুদ্দিন স্যার পড়াতেন অঙ্ক। আনাম স্যার পড়াতেন বৃটিশ ইতিহাস। ইব্রাহীম খলিল স্যার ছিলেন বয়সে তরুণ। নাটক লিখতেন নাটক করতেন সেই যুগে। ডাকবান হোস্টেলে তার সিরাজদ্দৌলার অভিনয় দেখেছিলাম। এখনো মনে আছে। দিশা খাঁর কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছেন, নাম সন্যাসী। সে নাটকটি কোথায় এখন—ঢাকা টেলিভিশনে সে নাটকটির কী এখন অভিনয় হতে পারে না। হতো বাজে ন্যাটকই তো হচ্ছে প্রতিদিন টিভিতে।